https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – II | March-April 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বনফুলের জীবনী নাটক 'শ্রীমধুসূদন'

গবেষকঃ দিবাকর দাস[1]
তত্ত্বাবধায়কঃ ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী[2]

সারসংক্ষেপ- *বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী সাহিত্য ব্যক্তিত্বের জীবন সমৃদ্ধ। নাটকের অনেক অংশ বা চরিত্র কাল্পনিক বলে নাট্যকার স্বীকার করলেও এ নাটককে সাহিত্যের সত্যে উন্নীত করেছেন। নাট্যকার বনফুলের কৃতিত্ব তিনি মানুষ মধুসূদন যেমন, ঠিক তেমন করেই তাঁকে 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থে দেখি, এক সঙ্গে তিন তিনটি গ্রন্থ রচনা ও নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি অমিতব্যয়ী, স্বেচ্ছাচারী হলেও তাঁর ইতিবাচক দিক কম ছিল না। তিনি ছিলেন মানবিক, বাংলা সাহিত্যের প্রতি ঋণী, তাঁর সীমাহীন দরদ এবং দায়বদ্ধতা।*

ঐতিহাসিক জীবনী নাটকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে ইতিহাসের নানা ঘটনার উল্লেখ করে সেই সময়ের ছবিটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। বুদ্ধিদীপ্ত অতিপ্রাকৃত (supernatural) ঘটনার অবতারণা এসব নাটকে করা হলেও এতে অলৌকিক ঘটনা সাধারণভাবে থাকে না। ইংরাজিতে শেক্সপিয়রের নাটকগুলি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে ঐতিহাসিক জীবনী নাটকে ইতিহাসের ঘটনার উল্লেখই শুধু নয়, নাট্যকারের স্বাধীন চিন্তাধারারও যথেষ্ট প্রয়োজন। নাট্যকার কল্পনার দ্বারা ইতিহাসের অনুক্ত অধ্যায়কে বাঙময় করে তোলেন। তবে কখনই তিনি ইতিহাসকে অস্বীকার করে নতুন কিছুর উপস্থাপন করতে পারেন না। এ জাতীয় নাটকে সাধারণভাবে নাট্যকার ইতিহাসের তথ্যকে ও সত্যকে বজায় রেখে বর্ণিত ঐতিহাসিক চরিত্রটির সঙ্গে উক্ত যুগের পরিবেশ ও পরিস্থিতির বাস্তবরূপ দিয়ে থাকেন। ইতিহাস-রস সৃষ্টিই ঐতিহাসিক জীবনী বা চরিত নাটকের একমাত্র মূলকথা নয়, এক মানবিক বাস্তব জীবনালেখ্য লেখাই আসল।

সূচক শব্দঃ *- জীবনী নাটক, অমিতব্যয়ী, স্বেচ্ছাচারী, বাস্তবিক ট্র্যাজিক চরিত্র।*

AIJITR - Volume - 2, Issue - II, Mar-Apr 2025

Copyright © 2025 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

মূল গবেষণা প্রবন্ধ- বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক সাহিত্যব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক লেখা হয়েছে। তার মধ্যে বনফুলের লেখা 'শ্রীমধুসূদন' নাটকখানিকে নাট্যসমালোচকসহ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। নাটকখানি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পুস্তক হিসাবে প্রকাশ পায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে, ইংরাজি ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। নাটকের প্রকাশের পর বহুনাট্যমোদী এই নাটককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। নাটকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত ও উপদেশ নাট্যকার 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে কবিকে নিয়ে বনফুল যেন একখানি নাটক লেখেন সেই আবদারও করেছেন। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও রসসাহিত্যিক কেদারনাথ

[1] *সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি*
[2] *সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.II.2025.78-87
AIJITR, Volume 2, Issue –II, March-April, 2025, PP. 78-87.
Received and Accepted on 17th March, 2025, Published: 30th April, 2025.

বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটক পড়ে লিখেছিলেন, 'তুমি একটা নূতন পথ খুলে দিয়েছো।' এমনকি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও এই নাটক সম্পর্কে লিখেছেন, 'আপনার বইটা মাইকেলের resurrection।'

১

বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' একখানি চরিত নাটক। ঊনবিংশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্যব্যক্তিত্ব মধুসূদন দত্তের জীবনের বা সাহিত্যের কোন একটি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে এই নাটক লেখা হয় নি। নাট্যকারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মধুসূদনের জীবনের প্রায় সব ঘটনাকে নাটকে উপস্থাপিত করা। তাঁর জীবৎকালের ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩০ বছরের ঘটনাগুলিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে বলে নেওয়া ভালো ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ বছরের ঘটনা মাঝে মাঝে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করেন নি।

নাটকের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য জেনে নেবো। ভাগলপুরে একটি মহিলা কলেজে আই.এ ক্লাসে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা পড়ানোর সময় বনফুল যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' জীবনী গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে বার বার মনে হতে থাকে মধুসূদনের জীবনী ঠিকমত তুলে ধরা হয় নি। এই গ্রন্থে মধুসূদনকে একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে কোথাও পান নি। তখন মধুসূদনের এক জীবন্ত মূর্তি ফুটিয়ে তোলবার জন্য একটি উপন্যাস লেখার কথা ভাবেন। কিন্তু বন্ধু অমলকৃষ্ণ রায়ের পরামর্শে 'শ্রীমধুসূদন' নাটক লিখে ফেললেন। সেকারণে নাটকটি অমলকৃষ্ণ রায়কে উৎসর্গ করেছেন। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'পশ্চাৎপট'- এ বনফুল নিজেই একথা উল্লেখ করেছেন।

নাট্যকার এই নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'ইহা ইতিহাস বা জীবন চরিত নহে, নাটক। ইহার সমস্ত কথোপকথন ও অধিকাংশ দৃশ্য পরিকল্পনা কাল্পনিক। মধুসূদনের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে তাহাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।'

বনফুলের কৃতিত্ব তিনি মানুষ মধুসূদন যেমন, ঠিক তেমন করেই তাঁকে 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থে দেখি, এক সঙ্গে তিন তিনটি গ্রন্থ রচনা ও নির্দেশ দিচ্ছেন। দেখি, তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রতি ঋণ, তাঁর সীমাহীন দরদ এবং দায়বদ্ধতা। তাঁর অনেক ভাষায় জ্ঞান ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। বাংলায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। দীর্ঘদিন ব্যাপি চলে আসা পয়ারের বন্ধনদশা থেকে তিনি কল্পনা তথা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম চতুর্দশপদী কবিতার রচনা করলেন। প্রথম ঐতিহাসিক ট্রাজেডি নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' ছাড়াও 'একেই কি বলে সভ্যতা?', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মতো কালজয়ী প্রহসনের রচয়িতা। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মতো শৈল্পিক মহাকাব্যের তিনিই প্রথম স্রষ্টা। আবার 'বীরাঙ্গনা' পত্র কাব্যের উদ্ভাবক একমাত্র তিনিই। বনফুল এইসব বিষয়কেই তাঁর নাটকে সুচারুভাবে অঙ্গীভূত করেছেন।

এই নাটকে প্রচুর চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ দত্ত, জাহ্নবী দেবী, গৌরদাস বসাক, ডিরোজিও, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রিচার্ডসন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ, ডেভিড হেয়ার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও প্রভৃতি। মধুসূদন এবং তাঁর বন্ধুদের অতিরিক্ত মদ্যপায়ী রূপে দেখানো হয়েছে। নাটকে বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ও মা জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে মধুসূদনের সম্পর্ক চিত্রণে নাট্যকারের মুন্সিয়ানা তারিফযোগ্য। সমগ্র নাটকে মধুসূদন, জাহ্নবী দেবী ও রাজনারায়ণসহ অন্যান্য চরিত্র চিত্রণেও বনফুলের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় পাই।

মধুসূদনের শেষ জীবনের আখ্যান রচনাতেও নাট্যকার তাঁর দরদী মানসিকতার পরিচয় পাই। 'সধবার একাদশী'তে চিত্রিত নিমে দত্তের মধ্যে নিজেকে প্রতিফলিত হতে দেখে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। মনমোহন তাঁর চরিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে নিজের সম্পর্কে বলেন–

'আমার চরিত্রে প্রশংসা করবার মতো কিছুই নেই- I am reckless, tactless, thoughtless and everything less!' একদিকে বিনয়ী অন্যদিকে হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। যে মধুসূদন দত্তকে নিজের প্রতিভার স্বীকৃতির জন্য সবসময় স্বচেষ্ট, স্বপ্নে বিভোর হতে দেখেছি সেই তাঁকে চরম বিষন্নতায় বলতে শুনি-

'Why should I drag on this miserable
existence anything more? Why should?'

বন্ধু মনমোহনকে জানিয়েছেন- "But the genius in dead long age, genius in another sense of the word. A dead volcano."

২

এবার, নাটকটির নামকরণ সম্পর্কে বলা যাক, মধুসূদন দত্তের এপিটাফ অর্থাৎ সমাধিলিপি থেকে নামকরণটি সংগৃহীত। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে একদিকে নাট্যকার যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো করেছেন, অন্যদিকে মধুসূদনের বঙ্গীয় সত্ত্বাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বাঙালিরা যেমন পুরুষ মানুষের নামের আগে হামেশাই 'শ্রী' অব্যয় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে যে 'মাইকেল' পদবি পেয়েছিলেন সেখান থেকে আবার তাঁকে বাঙালি করে তোলার জন্যই নাট্যকার যেন 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ করা করেছেন। কারণ, তিনি সাহেবী পোশাকেও ছিলেন খাঁটি বাঙালি তথা ভারতীয়। তাইতো প্রবাসে রামায়ণ, মহাভারত পড়ে খুশীতে ডগমগ হন যতই তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাঠ নিয়ে থাকুন না কেন।

৩

অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন-

"...'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' এই নাটক দুইখানি আধুনিক জীবনী নাটকের পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে। পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, আধুনিক সমাজের কীর্তিমান মহাপুরুষের চরিত্র অবলম্বনে কিরূপ সার্থক নাটক লেখা যায় তাহা বনফুল দেখাইয়াছেন। চরিত্রের বাস্তব জীবকাহিনী বিকৃত না করিয়া তাঁহার মানস প্রবৃত্তি, কথা ও আচরণের মধ্য হইতে কি ভাবে নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ পরিস্থিতি ও সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া নাট্যরস জমাইয়া তোলা যায় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা এই জীবনী নাটক দুইখানিতে পাইয়াছি।"[১]

অধ্যাপক ঘোষ জীবনীনাট্য রচয়িতা রূপে বনফুলের প্রশংসা করেছেন। 'শ্রীমধুসূদনে'র সংলাপ, মধুকবির পিতা রাজনারায়ণের চরিত্র চিত্রণ, পিতা পুত্রের স্নেহ অভিমান ভরা সংঘাত যা শিল্পসম্মত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি-

"শ্রীমধুসূদন' নাটকে একটি মনোভাব যে আবিষ্কার করা যায় না তাহা নহে। মধুসূদনের জীবন একটা ট্র্যাজেডি এবং যথার্থই মর্মবিদারী ট্র্যাজেডি। মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সর্বতোভাবে সার্থক। কীর্তিমান ও সর্বক্ষমতাবান রাবণ যেমন অদৃশ্য দৈবের নিষ্ঠুর তাড়নায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছেন মধুসূদনও তেমনি বোধ হয় এক অলক্ষ্য বিধাতার নির্মম খেয়ালে মানুষের সর্বোত্তম আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ লাভ করিয়াও সর্বহারা, পরিণামে আত্মবিসর্জন করিলেন। বোধহয় তাঁহারও শূন্যবক্ষ ভেদ করিয়া ক্লেশার্ত অনুযোগ উৎসারিত হইয়াছে।"[২]

চরিত বা জীবনী নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, একটি সংঘাতময় স্মরণীয় চরিত্রের তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলা। চিত্রিত চরিত্রের জীবনের নানা ঘটনাগুলি যথাসম্ভব যথাযথ রেখে নাট্যকার নানা দৃশ্যের মধ্যে নতুন রূপ দেন। পরিশেষে, শিল্পসম্মত রূপে চরিত্রটির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একটি পরিণতিতে পৌঁছান। আলোচ্য নাটকেও দেখি মধুসূদন

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

দত্তের সমগ্র জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় নাটকীয় সংঘাতে পরিপূর্ণ। তাঁর যেভাবে মৃত্যুবরণ দেখানো হয়েছে তা অনেকটা যেন গ্রিক শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিক নায়কদের মতো।

৪

আমাদের মনে হয়, এই নাটকে দু-একটি দৃশ্য 'নাট্যচিত্র' বলে মনে হলেও এবং এতে স্থান ও কালগত ঐক্য না থাকলেও, এক মুখ্য লক্ষ্যের প্রতি কাহিনির গতিশীলতা এমনভাবে দেখানো হয়েছে যার পরিণতিতে পাঠকের মনে 'ভয়'(fear) ও 'করুণা'(Pity)র ভাব তৈরি হয়। মধুসূদনের আঠারো বছর বয়সের জীবনকাল থেকে অন্তিম দিন অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সযত্নে সুবিন্যাস করে নাট্যকার বনফুল কাহিনির একটা অখণ্ড ধারার সৃষ্টি করেছেন। এর ফলে বিভিন্ন দৃশ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যেও সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি হয়েছে। মধুসূদনের মতো দুর্লভ প্রতিভাধর ব্যক্তির কীর্তিস্তম্ভের শেষ চূড়ায় যার আরোহণ কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। যে রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে কোনদিন পয়সা গুণে খরচ করে নি তাকেই যখন পরের দাক্ষিণ্যে শোচনীয় জীবনযাপন ও মৃত্যুবরণ করতে হয় তখন পাঠক, দর্শক ও আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি বৈকি। নাট্যকার সুকৌশলে মধুসূদনের একদিকে যেমন সৃষ্টি সুখের উল্লাস দেখিয়েছেন, অন্যদিকে স্বভাব ধর্মের অপার বেদনার চিত্র তুলে ধরে তাঁর ট্র্যাজিডিকে করুণ করে তুলেছেন।

নাট্যকার এই নাটককে ট্রাজেডি নাটক এবং মধুসূদন দত্তকে ট্র্যাজিক নায়ক রূপে উপস্থাপিত করার জন্য চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। মধুসূদনের খেদ- 'আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ জীবনে তা আর হল না- কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।' অর্থাৎ সুখে থাকতে চাওয়া- দুর্বার আবেগে জীবনকে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা সব বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে গিয়ে মৃত্যুসম ব্যর্থ জীবন মেনে নিতে হচ্ছে- এই ট্র্যাজিডি মধুসূদনেরই। একদিন যিনি ছিলেন আত্মগর্বী, আজ তিনিই বিনীত, বিধ্বস্ত। জীবন রথচক্র তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে গেছে বারবার, কিন্তু কোথাও এতটুকু শান্তি ও স্বস্তি পাননি। একজন সাহিত্য স্রষ্টার স্বাধীনতা যেটুকু থাকে, তাই দিয়ে নাট্যকার বনফুল এমন অনেক নাট্যমুহূর্ত গড়েছেন, যা অনেকাংশে কাল্পনিক হলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য। মোটের উপর মাইকেলের জীবন ইতিহাস এবং মনোজগৎ দুইই নিখুঁতভাবে এ নাটকে উন্মোচিত হয়েছে। কীসের উন্মাদনায় কিংবা কোন উদ্দাম প্রেরণায় মধুসূদনের জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে নাট্যকার অনবরত তারই অনুসন্ধান করেছেন। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, 'শ্রীমধুসূদন' শুধুমাত্র একটি জীবনী নাটক নয়। একটি সার্থক ট্র্যাজিডি রসাত্মক জীবনী নাটক।

৫

আলোচ্য নাটকে নাট্যকার সংলাপ ও দৃশ্য পরিকল্পনা নিজের মতো করে লিখেছেন। তবে 'মধুসূদনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির ও সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা' রক্ষা করতে নাট্যকার সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। ইউরোপীয় নাটকে সাধারণভাবে পাঁচটি অঙ্ক থাকে, সেই অঙ্কের মধ্যে আবার দৃশ্য বিভাগ থাকে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে কোন অঙ্ক বিভাগ ছাড়াই দৃশ্যের পর দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে। কুড়িটি দৃশ্য ও 'শেষ দৃশ্য' নাম উল্লেখ করে একটি অতিরিক্ত দৃশ্যের সংযোজন করা হয়েছে। মোট ২১ টি দৃশ্যের এই নাটক, যা সচরাচর হয় না। এর উত্তর অবশ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন-

"প্রতি দুই অঙ্কের মধ্যে সময়-সাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না বলিয়া সাধারণ প্রথামত নাটকটিকে আমি অঙ্কে বিভক্ত করি নাই।"[৩]

নাটকখানির গড়ে যদি ১০ মিনিট ধরে প্রতি দৃশ্যের অভিনয় হয়, তাহলে অভিনয়ের জন্য- ২১x১০ = ২১০ মিনিট অর্থাৎ সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একটি নাটকের অভিনয় সাধারণত আড়াই বা তিন ঘণ্টার বেশী হয় না। সেটি ব্যবসায়িক কারণেই। একটি নাটক কমপক্ষে দুইবার অভিনয় না হলে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে, নাট্য

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

নির্দেশক অভিনেয়ত্বের কাল-মাত্রাও আড়াই বা তিন ঘণ্টার মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে বলেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'সময় সাম্যে'র অভাবের জন্যই তিনি নাটকটিকে অঙ্ক বিভাগ করতে চান নি। একাধিক বিরতি নিয়েও একটি সমস্যার কথাও নাট্যকারের মাথায় আসে। একটানা দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনয় করা হলে অভিনয়ের সময় নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। অভিনেতা অভিনেত্রিদের পোশাক পরিবর্তন, মঞ্চসজ্জা করতে বা দৃশ্য পরিবর্তনে সময় লাগে। নাট্যকার তাই 'বিরতি'র দ্বারা অঙ্ক বিভাগের অভাব মিটিয়েছেন।

তবুও আমরা বলতে পারি এ নাটকখানি অভিনয় উপযোগী। কারণ, শুধুমাত্র অভিনয়ের কালব্যাপ্তি দিয়ে অভিনয়ত্ব যাচাই করা ঠিক নয়। 'শ্রীমধুসূদন' যতটা না অভিনয় করার নাটক তার থেকে অনেক বেশি পাঠ্য উপযোগী নাটক। পাঠক এই নাটক সমাদরে গ্রহণ করেছে। কিছু দর্শকও এই নাটককে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সেই দর্শক হল শৌখিন নাট্যশালার।

৬

নাটকের মধ্যে কালানৌচিত্য দোষ ঘটেছে। চতুর্দশ দৃশ্যে যতীন্দ্রমোহন তিন তিনবার 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য শুনছেন এবং 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পাণ্ডুলিপি ফেরত দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা সবাই জানি ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়, আর সেই বছরের মাঝামাঝি সময়ে এটি যখন অভিনয়ের জন্য মহড়া চলছিল, তখনই কথা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন মধুসূদনকে বলেছিলেন বাংলা ভাষায় Blank Verse-এ কবিতা লেখা সম্ভব নয়। অথচ মধুসূদন কিছুদিনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের প্রথম সর্গ লিখে যতীন্দ্রমোহনকে পড়বার জন্য পাঠান। সুতরাং 'তিলোত্তমাসম্ভব' পাঠকালে 'শর্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়ার ঘটনায় কালব্যত্যয় ঘটেছে বলা যায়। একই ত্রুটি পঞ্চদশ দৃশ্যেও দেখা যায়, যেখানে পণ্ডিতদের দিয়ে মধুসূদন একসঙ্গে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করছেন। বাস্তব তথ্যে আমরা জানতে পারি, ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে, সম্ভবত ফেব্রুয়ারিতে তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখতে শুরু করেন। সেই বছর ২৪ এপ্রিল রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন লিখছেন, 'In the meantime, I am going to celebrate the death of my favorite Indrajit', তাহলে নিশ্চয় তখন এ কাব্যের প্রথম কয়েকটি সর্গ লেখা হয়ে থাকবে। খুব সম্ভবত সেবছরের আগস্ট মাসের শেষ দিক করে তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লিখতে শুরু করেন। সুতরাং 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের চতুর্দশ দৃশ্যে বলা হয়েছে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক একই সঙ্গে লেখা হচ্ছে। এটি তথ্যগতভাবে ঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি। আসলে এই নাটকে উপস্থাপিত সব ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকলেও বনফুল কল্পনার দ্বারা যে নাট্য মুহূর্ত তৈরি করে ভিন্ন স্বাদ এনে দিতে পেরেছেন, তা আমাদের স্বীকার করতেই হয়।

৬

'শেষ দৃশ্য' উল্লেখ করে একটি অতিরিক্ত এবং কাল্পনিক দৃশ্যের উপস্থাপন করেছেন। নাটকে উল্লেখ করা হয়েছে রবিবার, ২৯ জুন, ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরে 'বঙ্গদর্শন'-এর ফাইল নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে লেখায় মগ্ন। এমন সময় তাঁর কাছে হঠাৎ করেই মধুসূদন দত্তের আগমন ঘটে। মধুসূদন তাঁর বইগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে উপহার দিলেন। বললেন-

"You have created real romances in our literature. I congratulate you.
আমার এই বইগুলো তোমায় দিতে এলাম- I hope you will take care of them"

...

"তোমার ওপর আমার অনেক আশা। I hope you will do what I could not."

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঠিক তারপরেই ঝড়ের বেগে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের ঘর থেকে বের হয়ে যান। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্বিত ফেরে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র অবাক হয়ে দেখলেন মধুসূদনের দেওয়া বইগুলিও কোথাও নেই। তখন তাঁর বাস্তবিক জ্ঞান হয় যে বাস্তবে মধুসূদন আর বেঁচে নেই। সেসময় তিনি মধু কবির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে বলে ওঠেন-

"মধুসূদন মরেনি- মরতে পারেনা- অসম্ভব।"

–এখানে মধুসূদনকে অমরত্ব দান করা হয়েছে। এখানেই আমাদের প্রশ্ন নাটকে এই 'শেষ দৃশ্যে'র প্রয়োজন কতখানি বা উপযোগিতা কতখানি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দৃশ্যকে 'অহেতুক' বলে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রশিষ্য বনফুল রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হলেও এই তাঁর মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি এবং পরবর্তী সংস্করণে এই দৃশ্য বাদও দেন নি। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই দৃশ্যের উপস্থাপন নিয়ে কোন বিরূপ সমালোচনা না করেও লিখেছেন, 'মধুসূদনের শেষটিতে বড় কায়দা করিয়াছেন- Finishing stroke যাকে বলে।' তবে আমাদের আবার শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গটি মনে করতে হয়। ঠিক সেকারণেই বনফুল, এই দৃশ্যটি দ্বিতীয় সংস্করণে রেখে দেন এবং নাটকে এর গুরুত্ব প্রমাণ করতে চান। সমালোচকের মতে, বনফুল এই দৃশ্যে মধুসূদনের ভূত নামিয়েছেন। এই অলৌকিক দৃশ্যে মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজের উত্তরসূরি নির্বাচন করেছেন। আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ স্বয়ং বাল্মীকিকে উপস্থিত হতে দেখেছি ও কবি মধুসূদনকে এই কাব্য লেখার দিক নির্দেশ দিতে দেখি। এই নাটকে তেমনই দৃশ্যের যেন পুনঃ অবতারণা ঘটেছে।

বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপনে বনফুল মধুসূদনকে ট্র্যাজিক চরিত্র করে তুলতে চেয়েছেন। এই ঘটনা তারই অবতারণা। তিনি নিজে যা পারেন নি সেটি পূরণ করার দায়িত্ব একজন যোগ্য ব্যক্তির হাতে সঁপে দিয়েছেন। তার ফলে পাঠকের মনে তাঁর প্রতি সহানুভূতি, করুণা, ভয় ও বিস্ময় ইত্যাদি তৈরি হয়। তাহলে বলতেই হয়, নাট্যকার সার্থকভাবেই 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটির ট্র্যাজিডি দেখিয়ে করুণরস সৃষ্টি করেছেন। নায়কের ভাগ্য পরিবর্তনে পাঠকের মনে ভয়, সমবেদনা, করুণা ইত্যাদি জাগলেও কাহিনিকে নিয়ে যেতে হয় এক ভাবমোক্ষমের অবস্থায়। 'শেষ দৃশ্য'টি সেই ভাবমোক্ষম ঘটিয়েছে। এতক্ষণ অসাধারণ প্রতিভাধর নায়কের ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য যেসব দর্শক বিমূঢ় হয়েছিল এবার যেন তারা কিছুটা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেন এই ভেবে যে, শরীরী মধুসূদনের মৃত্যু হলেও 'কবিশ্রী মধুসূদনের'র মৃত্যু হয়নি, হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে মধুসূদনের অমরপ্রতিভার সেই ভবিষদ্বাণীই ব্যক্ত হয়েছে। নাটকের এই পরিণামের পর দর্শকের আর কোন ঔৎসুক্য ও আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না। এই দিক থেকে আমরাও দৃশ্যটির উপযোগিতা অস্বীকার করতে পারি না।

৭

এবার আলোচ্য নাটকে ব্যবহৃত সংলাপ অর্থাৎ চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ করে নায়ক মধুসূদনের মুখে যে সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করবো। একটি কথা আমাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয় যে, মধুসূদনের মুখে যে সংলাপ দেওয়া হয়েছে তা পাঠ করলে সেযুগের ভাষা বলে মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়। সব স্থানে ইতিহাসের অনুসরণ করা হয় নি বলেও কখনও কখনও মনে হয়। কারণ, নাটক যে ধরণেরই হোক না কেন, তা মূলত সাহিত্যরসকে পূর্ণতা দিতেই লেখা হয়। নাটকের রসসৃষ্টি হয় চরিত্রের দ্বন্দ্বময় জীবনকে সঠিক চিত্রণের মাধ্যমে। যার প্রথম প্রকাশ সাধারণভাবে বাক্ অর্থাৎ সংলাপের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর সাহায্যেই নাট্যকার নাটকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য গড়ে তোলেন। সংলাপের সাহায্যেই চরিত্রটি নিজেকে, তার ভাব, প্রকৃতি বা স্বরূপকে প্রকাশ করে। সংলাপের ভাষা সবসময় চরিত্রের আচরণ অনুযায়ী বাস্তবানুসারী হতে হয়। নাটকের ভাব প্রকাশের জন্য অনেক সময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝাতে সংলাপ দীর্ঘ হয়, কখনও ছোট হয়। তার মাত্রা ও প্রকৃতি ঠিক রাখতে হয় এবং তা যেন কোনভাবেই অতিকথন না হয়। তা নাহলে নাট্যরস তৈরিতে ব্যাঘাত

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঘটে। চরিত্রগুলির উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে কাহিনি যদি গতিময়তা পায় তবেই সংলাপ নাটকীয়তা লাভ করে। নাটক স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে যায় ও সার্থক হয়ে ওঠে।

আলোচ্য 'শ্রীমধুসূদন' নাটকে বনফুল মধুসূদনসহ নাট্যোল্লিখিত অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের মুখে যথাযথ সংলাপ মধুসূদন চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন সন্দেহ নেই। কয়েকটি নমুনা আমরা দেখতে পারি। যেমন মধুসূদনের বাবা রাজনারায়ণ দত্তের ভাষা বাস্তবানুগ হওয়ার জন্য চরিত্রটি সার্থক হয়েছে। তিনি যখন বলেন-

"আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে খ্রিষ্টান করবে! স্পর্দ্ধা তো কম নয়। খুন করে ফেলব- রাজনারায়ণ মুনসিকে চেনেনা ব্যাটারা! লেঠেল আর শড়কিওয়ালা এনে আগুনে ছুটিয়ে দেব। দেখি ব্যাটাদের কতদূর হিকমৎ।" (দ্বিতীয় দৃশ্য)

তখন মুনসি রাজনারায়ণকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তাঁর স্বভাবপ্রকৃতি ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সহজেই আমরা বুঝতে পারি। ভদ্র গালাগাল 'ব্যাটারা' তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানানসই। আবার 'হিকমৎ' শব্দ ব্যবহারে বোঝা যায় তিনি ফারসিও জানতেন।

বনফুল এই নাটকের প্রায় সব সংলাপই সহজ সরলভাবে ও সুষ্ঠ উপস্থাপন করেছেন। এমন কয়েকটি চরিত্র রয়েছে যাদের মুখে কয়েকটি মাত্র সংলাপ দিয়েছেন, তবুও তাদের আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিছু কিছু দৃশ্যে খুব ছোট ছোট সংলাপ উপস্থাপিত হয়েছে, তবুও নাট্যঘন মুহূর্ত তৈরি হতে কোনরকম অসুবিধা হয় না। ব্যক্তি জীবনে মধুসূদনের সঙ্গে গৌরদাসের ঘনিষ্ঠতা সর্বজনস্বীকৃত। গৌরদাস যখন বলেন-

'আমি বৈষ্ণবের ছেলে- আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা। রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন।' তখন দর্শক সহজেই বুঝে যায় তৎকালীন রক্ষণশীল পরিবার তথা সমাজের মনোভাব কেমন ছিল।

নাট্যকার প্রয়োজনে চরিত্রের সংলাপ কাব্যিকও আঙ্গিকেও উপস্থাপন করেন। চরিত্রের চিন্তা ও কল্পনাশক্তি উন্নত হলে সেই চরিত্র আবেগী ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করবেন এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মধুসূদনের মতো একজন প্রতিভাবান উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবি তাঁর জীবনের অভিলাষ ব্যক্ত করতে নাট্যকারকে তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই হবে এমনই সংলাপ লিখবেন এটাও স্বাভাবিক। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি-

"...আমার জীবনের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা আমি মহাকবি হবো- Why আকাঙ্ক্ষা- a Conviction. I am destined to be a great poet. I sigh for Albion's distant shore- the land of Shakespeare and Milton. আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি- I cannot rest half way- I must soar up and up till I am tired and even then I shall soar. I cannot tie myself to a baby." (প্রথম দৃশ্য)

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর উক্তি, 'You are great, you are great, you are great my dear Vidyasagar- you are simple great', অথবা 'here is only one বঙ্গকুলচূড়া'। (ষোড়শ দৃশ্য)

ছোট উক্তি হলেও বক্তা মধুসূদনের মনোভাব স্পষ্ট। এই সংলাপে আবেগ আছে, অলঙ্কার আছে, কিন্তু আতিশয্য নেই। 'তুমি সাগর, তুমি রত্নাকর- তুমি নিঃস্ব। আমি কি এতোই বড় অভাগা যে চাইবামাত্র সাগরও শুকিয়ে যাবে' ইত্যাদি ছোট ছোট কথায় কাব্যিকতা প্রকাশ পায়। আবার 'ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পারো?' ভূদেবের এই সামান্য উক্তির মধ্য দিয়ে মধুসূদনের কবিপ্রতিভার প্রতি তাঁর যে কতখানি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ছিল তার প্রমাণ পাই। আবার এটাও বলা যেতে পারে এই উৎসাহের ফলেই হয়তো মধুসূদন দত্ত 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য লেখেন।

এই নাটকের নারীচরিত্রগুলির মুখে যে সংলাপ দেখি, সেখানে সংলাপের মধ্যে দিয়ে তাদের আলাদা করে চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী ও মেয়ে কমলমণির চরিত্র দুটির মুখে যে সংলাপ

ব্যবহার হয়েছে, সেখানে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। স্বামী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও বিন্ধ্যবাসিনী নিজেকে এই পরিবর্তিত ধর্মমতের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মন এখনও সনাতন গোঁড়া হিন্দুর মতোই রয়ে গেছে। বিন্ধ্যবাসিনী অন্তঃপুরের মানুষ, তাই তাঁর এই ধরণের কথাবার্তা অস্বাভাবিক নয়। মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দুশ্চিন্তা করা বা আশঙ্কা আর পাঁচজন মায়ের মতোই। জ্ঞানেন্দ্র মেয়ের পাত্র হিসাবে মধুসূদনকে পছন্দ করলে তার অভিব্যক্তি ধরা পড়ে এইভাবে-

“শুধু ছেলে ভালো হলেই তো চলবে না, আরও অনেক জিনিস ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত ওরা কায়স্থ। খ্রিষ্টানই হোক আর যাইহোক রক্ত তো বদলাবে না। তারপর দ্বিতীয় কথা খ্রিষ্টান হওয়ার জন্যে ওর বাপ হয়তো ওকে ত্যাগ করবে বিষয় সম্পত্তি থেকে। যদি বঞ্চিত করে ওকে। ওর হাতে কি মেয়ে দেওয়া উচিত হবে?”

(সপ্তম দৃশ্য)

“কিন্তু আসল কথা কি জান বাবা- আমরা নৈকষ্যকুলীনের বংশ- আমাদের বংশের মেয়েকে কায়স্থের হাতে দিতে কেমন যেন মন সরে না।” (সপ্তম দৃশ্য)

কমলমণি জ্ঞানেন্দ্রমোহনের স্ত্রী আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের থেকে অনেকটাই আলাদা। তার স্বাধীন চিন্তাধারা, তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তার পরিশীলিত মনের পরিচয় তার প্রতিটি কথায় প্রকাশ পেয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে সে বলছে-

“থাক ঢের হয়েছে। এদেশে মেয়েরা করবে ব্যারিস্টারি? তাহলেই হয়েছে। এমনিই তো তোমাদের গুপ্ত কবির ছড়ার জ্বালায় অস্থির। মেয়েরা ইস্কুলে সামান্য লেখা-পড়া শিখবে তাই নিয়েই তোমাদের কতো আন্দোলন... ব্যারিস্টারি করলেই হয়েছে। ভাগ্যে মিশনুরিরা কতকগুলো মেয়েদের ইস্কুল করেছে তাই এদেশে মেয়েদের বর্ণপরিচয় হচ্ছে। চোখ বুঝে ভাবছ কি?”

(সপ্তম দৃশ্য)

মা জাহ্নবী দেবীর সংলাপে পুত্র শোকাতুরা অবুঝ মাতার চরিত্রটি পাই-

“ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার ছেলেকে তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে এনে দাও। রাগ কোরোনা আমার ওপর- আমার মনের ভেতর কি হচ্ছে যদি বুঝতে পারতে তাহলে তুমি রাগ করতে না। প্রসন্নকে হারিয়েছি, মহেন্দ্রকে হারিয়েছি- শেষকালে কি মধুকেও হারাব!”

(চতুর্থ দৃশ্য)

পুত্রশোকে আচ্ছন্ন জাহ্নবীর মনের দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে তাদের দাসী ভিখারিনিকে ডেকে এনে গুপ্তকবি হিসাবে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর আগমনী গান গাইতে বলছেন। গান শুনে জাহ্নবী দেবী বলেন, ‘ওকে একটা টাকা দিয়ে দে’- এর বেশি কোন সংলাপ এখানে দেওয়া হয়নি। স্নেহবিহ্বল মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা যেন ভিখারিনির ওই গানের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। এরপর একজায়গায় দেখি, প্যারীচরণ যখন এসে জাহ্নবী দেবীকে জানায় ‘সে কিছুতেই এলো না’, তখন মায়ের মনের চরম বেদনা ও হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে মাত্র দুটি শব্দে ‘মধু এলোনা!’ অথবা দাসীর মুখে যে ভাষা দেওয়া হয়েছে- ‘গুপ্ত কবির গান গাইতে পারে সেই ভিকিরি মাগী এসেছে মা।’ তা একেবারে চরিত্রানুগ হয়েছে বলা যায়।

৮

আমরা জানি, মধুসূদনের সমগ্র জীবন নানান নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ। বনফুলের মূল লক্ষ্য ছিল, মধুসূদনের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি উপস্থাপন করে তাঁর চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরা। নাটকটি অঙ্কে বিভক্ত না হলেও পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডি নাটকের রসাস্বাদনে কোন বাধা হয় না। এই নাটকে একাধিক কাহিনি থাকলেও সব ঐক্যসূত্রে বাঁধা। ট্র্যাজেডির মধ্যে যে মর্মন্তুদ

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – II | March-April 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

বেদনা থাকে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেই বেদনার মধ্যে একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই দ্বন্দ্ব যত তীব্র হয় নাটকে ট্র্যাজেডিও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। অ্যারিস্টটল নায়কের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণকে বলেছেন 'হামারতিয়া'। পণ্ডিতগণ এর ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছেন চারিত্রিক ত্রুটি। অবশ্য এই ত্রুটি কোনো নৈতিক ত্রুটি নয়, তা হলো নিজ কর্ম, আচরণ বা সিদ্ধান্তের ত্রুটি। মধুসূদন জীবনে এমন বহু দুঃসাহসী হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তাঁকে অনিবার্য পতনের পথে নিয়ে গেছে। সঠিক সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ক্ষমতাই তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি বলে মনে করছি। এইসব বৈশিষ্ট্য একমাত্র শেক্সপিয়রের নাটকে আমরা দেখতে পাই। যা 'শেক্সপিরিয় ট্রাজেডি' নামে বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে পরিচিতিলাভ করে আছে।

মধুসূদন চাইলেই সারাজীবন সুখে আহ্বাদে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর উচ্চাকাঙ্খা জীবনকে সঠিক খাতে বইতে দেয় নি। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা মূলত ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা। এই কামনাকে আমরা জীবনীশক্তিও বলতে পারি। বিরাট ব্যক্তিত্বের মধুসূদন গভীর আত্মপ্রত্যয়ে সকলের ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছিলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা এতো বেশি ছিল যে কোন কিছুতে তা নিবৃত্ত হওয়ার নয়- "I cannot rest half way- I must soar up and up till I am tired and even then I shall soar." কিন্তু যখন সেটি পূরণ হয় নি তখন তাঁর আক্ষেপ ধরা পরে, "আমি সুখে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ জীবনে তা আর হলো না- কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।" দারিদ্র্য ও অন্যান্য দুর্ভোগে বিপর্যস্ত হয়ে, পরিশেষে, সবকিছু নিঃশেষ হয়ে তাঁর কষ্ট ধরা পরে- 'আমি ফুরিয়ে গেলাম! Men end so quickly!' স্বভাবমহান মধুসূদন 'জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি'- বলে নিরুপায় ভাবে জীবনের চরম সত্য মৃত্যুকে বরণ করেছেন। মৃত্যু সন্নিকটে জেনেও তিনি বলেছিলেন- 'I shall die the gloriously miserable death of a poet.' নাট্যকার মর্মান্তিক এই ট্র্যাজিক পরিণামকে নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

মধুসূদন সবসময় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে বার বার বাধা পেয়েছেন। ফলে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব। মধুসূদনের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিত্ব কখনই বার বার ব্যর্থতা সহ্য করতে পারে না। মধুসূদনের জীবনীশক্তির প্রাচুর্য ছিল অধিক মাত্রায়। তা প্রকাশ পেয়েছে তিন ভাবে- অনমনীয় ইচ্ছাশক্তিরূপে, বাধাবন্ধহীন স্বাধীন কামনা রূপে এবং জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহারূপে। যার মূল লক্ষ্য ছিল বড় ইংরেজ কবি হওয়া। বন্ধুদের তিনি বলেন-

"যদি ইংলন্ডে যেতে পারি, দেখিস আমি কত বড় কবি হবো। I happen to be a great poet what I am almost sure. I shall be, if I can go to England." (গৌরদাস বসাককে লেখা চিঠির অংশ)

মধুসূদন চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও প্রকাশ পেয়েছে-

"আমার ambition অনেক বেশি- I want to go England- I want to become a Great poet. Why should I do in this barbarous Hindu Society of Bengal?" (পঞ্চম দৃশ্য)

মধুসূদনের এই ব্যক্তিত্বই যেন তাঁর নিয়তি (destiny) লিখে দিয়েছে। এর থেকে বলতে পারি, আত্মগর্বী মধুসূদন অন্ধ আবেগে আগুনের শিখার দিকে পতঙ্গের মতো ছুটে গিয়েছিলেন।

অমিত প্রতিভাধর উদ্দাম বেগবান পুরুষটি ঋণে, অসুখে জর্জরিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। শারীরিক অবস্থা যেন তাঁর করুণ পরিণতিকে আরও শোচনীয় করে তোলে। যশ, খ্যাতি, অর্থের পেছনে ছুটতে ছুটতে কখন যে তিনি 'কাল সিন্দুর পানে' তলিয়ে গেলেন সে খেয়ালই হয়নি। কষ্ট পান এই ভেবে, 'Men end so quickly.' ভাবনাগুলিকে দূরে রাখতে পারেন না। যতক্ষণ বেঁচে আছেন ভাবনাগুলো থাকবেই- 'this brain is a terrible machine!' রোগ তাঁকে চারিদিকে ঘিরে ধরেছে। গলায় ঘা হয়েছে, পেটে জল জমেছে, পিলে হয়েছে, লিভার বড় হয়েছে, মাঝে মাঝে রক্ত বমি করছেন, তবু আত্মাভিমানী পুরুষটি

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

কবিরাজি চিকিৎসা করিয়ে নিজেকে ছোট করতে চান না। 'cannot degrade myself.' একক বিদ্রোহী এই মানুষটি নিজের চরম দুঃখকষ্টের দিনেও উজ্জ্বল ও মহৎ হয়ে ওঠেন দুঃখকে সহ্য করার মধ্যে দিয়ে, কোথাও হার স্বীকার না করে।

তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর শেষ জীবনের পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু তবুও নির্জলা ব্রান্ডি এবং ইনফার্নোকে সঙ্গী করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, গলায় ছুরি বসানোর চেয়ে, এভাবে আত্মঘাতী হওয়ার বেদনা অনেক কম- 'but this is a process equally sure but less painful.' তাই বলে, তিনি এতো তাড়াতাড়ি এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চান না। অথচ এই যন্ত্রণা থেকে, মনোকষ্ট থেকে আশু কোন মুক্তি তিনি খুঁজে পান নি। আবার বেঁচে থাকার কোন অর্থও তিনি খুঁজে পান নি। যে প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর গর্ব ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। এখন তিনি সেই সব দিনের ছায়া মাত্র। আর্তকণ্ঠে শেক্সপিয়রের লেখা নাটকের নায়ক ম্যাকবেথের মতোই বলেন, 'Out, out brief candle.' দুঃসহ জীবনের এ এক স্বকরুণ আর্তনাদ। নিঃসহায় নিরুপায় জীবনের এই করুণ পরিণতির জন্য অবশ্য তিনি নিজেই দায়ী। হয়তো সেকারণেই তিনি নিজেই নিজের সমাধিলিপিটিও লিখে রেখে গেলেন-

'I am digging my own grave why shall I not write my own epitaph too.'

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. ঘোষ অজিত কুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা বই মেলা, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৩৫৮।

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৩।

৩. ঘোষ, অমল কুমার, 'বনফুলের জীবনী নাটক'; শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৮।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ঘোষ, অজিত কুমার, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৫।

২। ঘোষ, অমল কুমার, 'বনফুলের জীবনী নাটক'; শ্রীমধুসূদন এবং বিদ্যাসাগর', পুস্তক বিপণি, কলকাতা,২০২৩।

৩। ঘোষ, জগন্নাথ, 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, বইমেলা, কলকাতা, ২০০৯।

৪। 'বনফুলের নাটক সমগ্র'(প্রথম খন্ড), অক্ষরবিন্যাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৯।

৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৮।

৬। সেনগুপ্ত, প্রদ্যোত, 'বাংলা নাটক-নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ', প্রথম খণ্ড, বর্ণালী, আগস্ট, ২০০৯।

৭। সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড থেকে পঞ্চম খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল, ২০১৮।

৮। হোসেন সেলিনা ও ইসলাম নরুল (সম্পাদক), 'বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান', প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ, ১৯৮৫।